এই অবেলায়

রবীন চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

॥ ১ ॥

সোমনাথের জীবনে মোহনলালের আবির্ভাব একটা অভাবনীয় ঘটনার মধ্যে দিয়েই ঘটেছিল।

শনি, রবি সপ্তাহে দু-দিন স্কুল ছুটি। উইক এন্ড কাটাবার জন্য সোমনাথ শনিবারই দার্জিলিং-এ হোটেলে এসে উঠেছিল। হোটেলের মালিক মিঃ মিশ্র ওর পরিচিত, কোলকাতার লোক। এর আগেও সোমনাথ একবার এই হোটেলে উঠেছিল। ম্যালের কাছেই হোটেলটি, বেশ চালু। নাম 'দি সাম্মিট'। দোতলায় কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে মুখ করা ছোট্ট একখানা ছিমছাম ঘর। সোমনাথের সঙ্গে শুধু একটা অ্যাটাচি কেস, তাতে দু-একটা জামা প্যান্ট, টাওয়েল আর কিছু টাকা-পয়সা।

রবিবার সকালে ম্যাল থেকে পায়চারী করে হোটেলের কামরায় ফিরে এসেই গোলমালের সূত্রপাত। অ্যাটাচি কেসটা খোলা, টাকা-পয়সা কিছুই নেই, ঘরটাও খোলাই ছিল। কেসটাতেও চাবি ছিল না। এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলে সোমনাথের একবারও মনে হয়নি। কারণ হোটেলের মালিক থেকে শুরু করে সকলেই ওর পরিচিত। অগত্যা ব্যাপারটা মিঃ মিশ্রকে জানাতেই হলো। তারপরই একটা বিশ্রী ব্যাপার। প্রথমে ডাক পড়ল মোহনলালের। অকথ্য অত্যাচার আর মার শুরু হল মোহনলালের উপর। সোমনাথ কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেল। নিজেকেই নিজের অপরাধী মনে হতে লাগল। না প্রকাশ করলেই হতো ব্যাপারটা। বড়ো জোর শ-তিনেক টাকা ছিল কেসটায়। একটা প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় সোমনাথ গিয়ে মিশ্রজীর হাত দুটো ধরেছিল।

"মিঃ মিশ্র এবারকার মতো ওকে ছেড়ে দিন। আর তাছাড়া ওযে টাকাটা নিয়েছে তারও তো কোনো প্রমাণ নেই, কেন বেচারাকে এভাবে মারছেন।"

"আপনি জানেন না, সোমনাথবাবু, এই হারামির বাচ্চা আগেও এরকম দুবার চুরি করে ধরা পড়েছে। ওর জন্য আমার হোটেলের বদনাম হয়ে যাচ্ছে।"

মিশ্রজি বিহারের লোক হলেও চোস্ত্ বাংলায় কথাগুলো বলেছিলেন।

"তা হোক, আমার অনুরোধ, এবারকার মতো ওকে মাফ করে দিন।"

"মাফ করব! বলেন কী সোমনাথবাবু। এমন করলে তো আমার ব্যবসা লাটে উঠে যাবে। আপনি বলছেন যখন, আমি ওকে পুলিশে দিচ্ছি না। তবে আমার হোটেলে ওর আজ থেকেই চাকরি খতম।"

এই বলেই মোহনলালকে ঘাড় ধরে হোটেলের বাইরে বার করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই একটা ভাঙা টিনের বাক্স ছিটকে এসে পড়ল বাইরে — মোহনলালের নিজস্ব সম্পদ। একটা বাঁশের বাঁশি, একটা লাল লাট্টু, দু-একটা ছেঁড়া জামা, আর জামার ভাঁজ থেকে বেরিয়ে এল একটা লম্বা ফলাযুক্ত ছুরি।

"দেখেছেন, সোমনাথবাবু! ব্যাটা আবার চাক্কু লুকিয়ে রেখেছে।"

সোমনাথ ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত। মনটাও খুব খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিল দু-চারদিন থাকবে। কিন্তু এখন আর একমুহূর্ত থাকার ইচ্ছে নেই। ইচ্ছেটা মিশ্রজিকে জানালও।

"সে কি সোমনাথবাবু, কাল এসে আজই চলে যাবেন। বুঝেছি ছোকরাটা আপনার মন খারাপ করে দিয়েছে। আমি বলছিলাম কী আরও কয়েকটা দিন থেকে যান। টাকা-পয়সা নিয়ে ভাববেন না, এর পরের বার না হয় দিয়ে দেবেন।"

"না, না মিশ্রজি, সে সব কিছু নয়। কাল সকালে চলে যেতামই। একটা কাজের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

নিরুপায় হয়ে অসত্যের আশ্রয় নিতে হল সোমনাথকে।

"প্রয়োজন যখন তখন তো যেতেই হবে। আবার সময় করে আসবেন। আপনাদের মতো দু-চারজন ভালো লোক এলে ভালো লাগে।"

দশটার বাস ধরলে বেলা বারোটায় কার্শিয়াং-এ পৌছানো যাবে। যথা সময়ে তৈরি হয়েও দশটার বাস ধরতে পারল না সোমনাথ। পরের বাস এগারোটায়। বাস টারমিনাসের একটা সিমেন্ট বাঁধানো বসবার জায়গায় সেদিনকার কাগজ খুলে বসল সোমনাথ। কাগজের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্কতায় ডুবে গিয়েছিল সে।

"বাবুজি। হামকো কসুর হো গয়া। মাফ কিজিয়ে বাবুজি।"

"মোহনলাল। তুই.....এখানে।"

"হ্যাঁ বাবুজি। আপকো কসম খাকে বোলতা, ম্যায় আপকে রূপয়া নেহি চুরায়া।"

"তা আমাকে একথা বলতে এসেছিস কেন? মিশ্রজির কাছে যা। গিয়ে বল তুই চুরি করিস নি।"

"নেহি বাবুজি। ম্যয় উহাপর ফির নহি যাউঙ্গা।"

"তুই আগেও দু'বার চুরি করেছিস। একথা সত্যি?"

"হ্যাঁ, বাবুজী সাচ্।"

"কেন করিছিলি?"

"সোচ রহে থে, কুছ রুপয়া জমা করকে ঘর চল যায়গে। ঘরপর মেরে পিতাজি বুড়া হো গয়া। ইসিলিয়ে হামারা দিল হামেশা খোয়া রহতা হ্যায়।"

"তোর দেশ কোথায়?"

"রাজস্থান। বাবুজি মেওয়ার।"

"দেশে আর তোর কে কে আছে।"

"ঘরপর মেরা অউর কোই নেহি হ্যায়।"

"তা বুড়ো বাপকে ছেড়ে চলে এলি কেন?"

"ঘরপর রহনেসে খানা নেহি মিলতা থা। অভি হেয়াপর কাম করকে মাহিনা মাহিনা কুছ রুপয়া বাবুজিকো ভেজতে রহতে থে।"

"তা এখন কী করবি?"

"ম্যায় কেয়া বাতাঁউ। ম্যায় কৌন কাম করুঙ্গা।"

"দেখে আপকো, গোঁসা করকে চলে যাতে থে" —

একথা বলেই মোহনলাল কান্নায় ভেঙে পড়ে। সোমনাথের মনটা ব্যথায় ভরে উঠল। ভাবল, মোহনলালের সব কথা মিথ্যা নাও হতে পারে। দেশে যাওয়ার জন্য, বুড়ো বাপকে দেখার জন্য এরকম একটা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হয় না।

এদিকে বাসের সময় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মোহনলালকে এরকমভাবে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না সোমনাথের।

"আচ্ছা মোহনলাল তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

"বাবুজি", বলেই ওর মুখটা আনন্দে ঝলসে ওঠল। চোখে ওর জল।

"নে চল। তাড়াতাড়ি বাসে ওঠ।"

ভাঙা টিনের বাক্সটা নিয়ে মোহনলাল সোমনাথের পিছু পিছু বাসে গিয়ে উঠল।

সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বাস ধীরে ধীরে নামছে।

"শোন আমার বাড়িতে কিন্তু একখানা মাত্র ঘর। সঙ্গে একটা ছোট্ট রান্নাঘর আর বারান্দা।"

"বহুত আচ্ছা বাবুজি। হাম বারান্দামে শো যায়েঙ্গে।"

"তারপর তুই দেশে চলে যাস। যাওয়ার জন্য যা খরচ লাগবে আমি দিয়ে দেব।"

সাতদিনের মধ্যেই সোমনাথ মোহনলালকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু দু-সপ্তাহের মধ্যেই মোহনলাল কার্শিয়াং ফিরে এল।

সেদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরেই সোমনাথ অবাক। মোহনলাল বারান্দায় মাথা নিচু করে বসে আছে।

"কিরে মোহনলাল ফিরে এলি?"

"হ্যাঁ বাবুজি। ঘরপর যাকে ম্যায়নে বুড়া পিতাজিকো দেখ নেহি সকে। শুনে বহোত বিমার হো। বিনা ইলাজকে মর গয়ে।"

দুজনেই বেশ কিছুক্ষণ নীরব।

"বাবুজি। আপ হামকো রাখ লিজিয়ে বাবুজি। আপ যো ভি কহেঙ্গে ম্যায় ওহি করুঙ্গা। খানা বানানে সে লেকর ঘর কা সব কাম করুঙ্গা বাবুজি। ম্যায় আপহিকে সাথ রহুঙ্গা।"

অচেনা, অপরিচিত, অজ্ঞাতকুলশীল মোহনলাল। তাই কিছু দ্বিধা ও অনিয়শ্চতার মধ্যে কিছুদিন কেটেছিল সোমনাথের।

আজ ভাবলেও অবাক লাগে সোমনাথের। সেই মোহনলালই এখানে ওর বিশ্বস্ত আপনজন। এই তেরো চৌদ্দ বছরের রাজস্থানী ছেলেটিই একাধারে ওর রক্ষক, অভিভাবক, আর অকৃত্রিম বন্ধু। বাজার করা, দু-বেলা রান্না করা, কটেজের সামনে ফুলগাছগুলোর সকাল-বিকাল পরিচর্যা করা থেকে শুরু করে সবকিছুই মোহন নিতান্ত আপনজনের অকৃত্রিম নিষ্ঠার সাথেই সমাধা করে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে মোহনই সোমনাথের সাথে কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনার নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

॥ ২ ॥

সোমনাথ সেদিন বাড়ি ফিরে এসেই একখানা চিঠি পেল। চমৎকার, ঝকঝকে হাতের লেখা। দু-তিনবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চিঠিটার গায়ে পোস্টাল স্ট্যাম্প দেখে বুঝবার চেষ্টা করল চিঠিটার উৎসস্থল। হাতের লেখাটাও কেমন যেন খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

চিঠিখানা টেবিলের উপর রেখে দিল না খুলেই। জামা-জুতো খুলে একটু ঢিলে হয়ে বাথরুমে ঢুকল। এটা ওর রোজকার অভ্যাস। বাইরে থেকে এসেই সাবান দিয়ে হাত-মুখ না ধুলে নিজেকে কেমন অপরিষ্কার মনে হয়। একটা নোংরা নোংরা ভাব লাগে। বাথরুমটা বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন বেশ খানিকটা লম্বা চওড়া। এই পর্যন্ত জীবনে এসে কার্শিয়াং-এর মতো এমন সুন্দর নির্জন পাহাড়ি জায়গায় যে মনের মতো একটা কাজ খুঁজে পাবে সোমনাথ তা কোনোদিন আশা করেনি।

ওর কল্পনায় যে এমন একটা জীবনকে পাবার আকাঙ্ক্ষা ও কোনোদিন করেনি তা নয়। বরং উল্টোটাই বলা চলে। একটা ছোট কটেজ, নির্জন জায়গা, শাল আর পাইনের হৃষ্টপুষ্ট গাছগুলি ধাপে ধাপে উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। সকালে কত নাম জানা, বেশির ভাগই অজানা পাখির কতরকম সুর। বিচিত্র রঙের পাহাড়ি ফুলের সমরোহ আনাচে কানাচে। বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই, পাহাড়ের ধাপে ধাপে লুকোচুরি খেলতে খেলতে সরু রাস্তাগুলো এঁকেবেঁকে নেমে গেছে নীচে, দূরের গ্রামগুলোর দিকে। সামনে ধোঁয়াটে রঙের বিশাল পর্বত-প্রাচীর। ওর দিকে তাকালেই নিজেকে

কত ছোটো মনে হয়। পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা সর্পিল পথ কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। খুব ভোরে উঠলেই দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার অনির্বচনীয় গলানো সোনার রূপ, এই মহিমান্বিত রূপের সামনে দাঁড়ালে পৃথিবীর সব দুঃখ, গ্লানি, নৈরাশ্য কেমন যেন ফিকে হয়ে যায়। সব কিছুর অর্থহীনতার উপলব্ধি ভরে ওঠে সুগভীর এক পরিতৃপ্তির আমেজে। এই পরিতৃপ্তির পর আর কিছু পেতে ইচ্ছা হয় না। সর্বগ্রাসী আলোর ঢেউ লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি — যেন সমস্ত সত্তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কথা ও মনের অগোচর উপলব্ধিতে প্রতিটি ঝলমলে সকালই যেন নতুন করে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। সোমনাথ বুঝতে পারে না এ উপলব্ধির স্বরূপ। বিচিত্র রঙের ইন্দ্রজাল, পাহাড়ি নির্জনতার অব্যক্ত কণ্ঠস্বর। প্রকৃতির এই পাগল-করা রূপ, এই মুগ্ধতা, এই কি প্রেম!

এই জীবন, এই রূপমুগ্ধতা, এই প্রেমের স্বপ্নই তো সোমনাথ কত লক্ষবার দেখেছে, সে কি ভাবতে পেরেছিল? কেজো শহর কোলকাতার চাকুরি ছেড়ে, আসানসোলের কলেজের শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়ে যখন সে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরবার জন্য, এমন একটা কিছু যা শহুরে জীবন থেকে আলাদা অথচ সে যা চায়, এতদিন যা চেয়ে এসেছে, পায়নি কখনও।

এমন সময়েই সুযোগটা পেয়ে গেল সোমনাথ। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই ও দরখাস্ত করেছিল। নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে, যেমন আর দশটা জায়গায় করত। হঠাৎ ইন্টারভিউ-এর চিঠি। কার্শিয়াং-এর এই মাঝারি ধরনের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চাকরিটা হয়ে গেল। ইন্টারভিউ দিতে এসেই সোমনাথ মনস্থির করে ফেলেছিল। যদি হয় চাকরিটা ও অ্যাকসেপ্ট করবে। এমন সুন্দর জায়গায় স্কুল, পরিবেশ, শান্ত সরল মানুষগুলো সবই সোমনাথের ভালো লেগেছিল। মনে মনে তো এমনটাই চেয়েছিল ও বহুকাল ধরে। ছোটো চাকুরি। বর্তমানে প্রয়োজনও ওর ছোটো। তাছাড়া এই ছিমছাম পাহাড়ি কটেজটা। সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত স্কুল। সমস্ত সকালটা আর বিকেলটা ওর একান্ত নিজের।

স্কুল থেকে তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরে আসে সোমনাথ। চড়াই-এ দশ মিনিট হেঁটে ও বাড়ি পৌঁছে যায়।

বাড়ি ফিরেই হাঁকডাক শুরু করে দেয় —

"মোহন, মোহন, কোথায় গেলিরে।"

"জি বাবু!" মোহন হাজির হয় ডাকতে না ডাকতেই।

মোহন জানে সোমবাবুর ফিরবার আগেই গরমজল বাথরুমে রেডি রাখতে হবে। তারপর চায়ের জল বসিয়েই দু-চারখানা রুটি আর সবজি। এতেই সোমবাবুর হয়ে যায়।

॥ ৩ ॥

রোজই এসময়টা সোমনাথ খুব মেজাজে থাকে। বাথরুমে সোমনাথ যখন স্নান করে, রান্নাঘর থেকে মোহন কান খাড়া করে থাকে। কী সুন্দর সোমবাবুর গলা। সবটা বোঝে না, কিন্তু ভালো লাগে। সোমবাবুর কাছে শুনেছে রবি ঠাকুরের গান। আজকের গানটা মোহনের খুবই ভালো লাগছে। ইচ্ছে করছে অমন সুন্দর করে যদি ও বাঁশি বাজাতে পারতো —

"গায়ে আমার পুলক লাগে
চোখে ঘনায় ঘোর।
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা রাখীর ডোর।

আজিকে এই আকাশতলে
জলেস্থলে ফুলে ফলে
কেমন করে মনোহরণ
ছড়ালে মন মোর।"

গুনগুন করতে করতে বাইরে বেরিয়ে আসে সোমনাথ। পাঞ্জাবি পাজামা আর শালটা জড়িয়ে বাইরে ছোটো লনে ইজি চেয়ার পেতে আরাম করে বসে।

দূরে স্বচ্ছ নীল কাচের মতো আকাশের গায় ছেঁড়া ছেঁড়া হালকা মেঘের পালক্। একটু পরেই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় মোমের মতো গলানো রুপোর উপর হোলি খেলে সূর্য দূরের পাহাড়টার ওপারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। চারিদিকে ঝাপিয়ে পড়া আঁধারের পটভূমিতে বরফের চূড়াগুলো তখনও জ্বলজ্বল করতে থাকবে। এ দৃশ্য প্রতিদিনের। তবু এই একই দৃশ্য সোমনাথ প্রাণভরে দেখে। একই রঙের সমুদ্রে ও রোজই অবগাহন করে।

এমন সময় মোহনলাল টেবিলের উপর রাখা এনভেলাপটা এনে সোমনাথকে দিল। চিঠিখানার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। স্পিড পোস্টে পাঠানো চিঠিখানা দু-একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনভেলাপটা খুলে একটু অবাক হয়ে গেল। ফিকে নীল রঙের চারভাঁজ করা পুরু কাগজের চিঠিখানা দেখে তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলে নীচের নামটা পড়েই সোমনাথের মনে হঠাৎ যেন একটা উথাল পাথাল ঝড় বয়ে যায়।

এই মুহূর্তে সোমনাথের হৃদয় গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। রাশি রাশি অব্যক্ত কথা, ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল, রাগ, দুঃসাহসিক অভিমান আরও কত কী। সব কিছু মিলিয়ে পরিপূর্ণ তার হৃদয়-পাত্রখানির ঢাকনা যেন হঠাৎই দমকা বাতাসে উড়ে যায়। সোমনাথ শেষটুকু পড়ে ফেলে এক নিশ্বাসে।

"শেষ তো করতেই হয়। তাই আজ এখানেই শেষ করছি। আশীর্বাদ চাইবার অধিকারটুকু বোধ হয় হারাইনি। ওটা আমার পাওনা।

অহংকারী মেয়ে — মেমসাহেব।"

কবিগুরুর '২৮ শে ফাল্গুন'-এর গান দিয়ে চিঠিখানা শুরু —

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি চরণ, আমি
পাইনে তোমারে।"

" অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পরও যখন ঠিক করতে পারলাম না কি বলে সম্বোধন করব, তখন উহ্য রাখবার সবচেয়ে সহজ রাস্তাটাই মনে পড়ে গেল। কবিগুরুই সে রাস্তা বলে গিয়েছেন। এই না পাওয়ার চরম বেদনা, অতৃপ্তির মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে সার্থকতা। তাই বুঝি পরম প্রাপ্তি। যাক নেহাত নিজের মনের তাগিদেই একটু কাব্য করলাম। মনে হয় এই বাচালতাটুকু অন্তত আজ ক্ষমা করে নেবেন।

কেন এমন করে পালিয়ে গেলেন? বলে গেলে কি আপনার পরবাসের শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটত? দেখলেন তো ঠিক খুঁজে নিতে পেরেছি যাযাবরের আস্তানা। আশা করি, শরীর ভালো আছে। আলাদা পরিবেশে, প্রকৃতির অঢেল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে মন ভালো থাকারই কথা। ওখানে তো আর একঘেয়ে জীবন, দায়দায়িত্ব, সর্বোপরি কথা না শোনা মেমসাহেব নেই।

এবার একটু প্রসঙ্গান্তরে আসি। আমার বিয়ে। জানি আপনি আসবেন না। আপনার তো আবার বিয়ে বাড়ি গেলে অ্যালার্জি হয়। এ যাত্রায় উপহার দেওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেলেও